কাঁটা ও ফুল

ইয়াহইয়া সিনওয়ার

অনুবাদ
মনযূরুল হক

লেখকের ভূমিকা

এটা আমার নিজের গল্প না। অথবা অন্য কারও বলা কাহিনিও না। বরং এই গল্প সবার—ফিলিস্তিনি জনমানুষের। এর প্রতিটি ঘটনা সত্য। উদ্দেশ্য ছিল, যাপিত জীবনের অনেক ঘটনা সমন্বিত করে একটা উপন্যাসে রূপান্তরিত করা। এমন কতগুলো চরিত্র নির্মাণ করা, যাদের চারপাশে অজস্র বাধাবিপত্তি আবর্তিত হয়েছে। এখানে যা যা বলা হয়েছে, তার বেশিটা আমি তাদের কাছে শুনেছি, কিংবা নিজেই থেকেছি তাদের জীবনের সাক্ষী। অবারিত কষ্ট-ক্লেশ তাদের জীবনকে আকার দিয়েছে এবং তাদের চলার পথ নির্দেশ করেছে।

উৎসর্গ করছি তাদের নামে, যারা তাদের হৃদয় বেঁধেছে ইসরা ও মিরাজের পবিত্র ভূমিতে, সাগর থেকে উপসাগর পর্যন্ত না; বরং সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত।

ইয়াহইয়া ইবরাহিম সিনওয়ার
বিরশেবা কারাগার, ২০০৪

ইয়াহইয়া সিনওয়ার : বিশ্ব তাকে যেভাবে দেখে

ইবরাহিম দুওয়াইরি, মৌরিতানিয়া

কীভাবে হামাসের নেতা ইয়াহইয়া সিনওয়ার দখলদার ও বিশ্বের সমস্ত প্রতিরোধ উপেক্ষা করে খেলার নিয়ম বদলে দিতে পেরেছেন? সঠিকভাবে বলতে গেলে, সেটা হলো, শক্তির ভারসাম্য দিয়ে। আরবিতে যাকে বলে 'খাওয়া' (خاوة)—যা ফিলিস্তিনিদের ভাষায় জোরপূর্বক আদায় করা। সিনওয়ার নিজেই এই শব্দটি উচ্চারণ করতে পছন্দ করেন।

২০১৭ সালের ২৫ মার্চ, শনিবারের দুপুর, গাজার অন্যতম প্রাচীন মসজিদ—মসজিদ আল-ওমরিতে এক শোকাবহ পরিবেশ। গাজার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হামাসের শত শত নেতা, সদস্য ও জনসাধারণ জড়ো হয়েছেন। উদ্দেশ্য একটাই—মাজেন ফুকাহার জানাজায় অংশগ্রহণ। আগের রাতে তাকে গোপন হামলায় হত্যা করা হয়েছে। গাজায় তার বাড়ির সামনে নিঃশব্দ চারটি গুলিতে তাকে হত্যা করা হয়।

মাজেন ফুকাহা ছিলেন ফিলিস্তিনি যোদ্ধা, যিনি ২০১১ সালে বন্দি বিনিময়ের সময় ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্তি পান। তার বিরুদ্ধে ইসরায়েলি প্রশাসনের বহু অভিযোগ ছিল, বিশেষ করে পশ্চিম তীরে হামাসের সামরিক শাখা গঠনে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ৯টি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু মুক্তির পর আবারও যুদ্ধে ফিরে আসেন।

ইসরায়েলের এই হত্যা ছিল শুধু একজন যোদ্ধার মৃত্যু নয়; বরং হামাসের নতুন নেতা ইয়াহইয়া সিনওয়ারের প্রতি একটি সুস্পষ্ট বার্তা। এটি ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। তারা যেন দেখাতে চেয়েছিল, তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও গোয়েন্দা বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও, ইসরায়েল যেকোনো মুহূর্তে গাজার কেন্দ্রস্থলে আঘাত হানতে সক্ষম। সিনওয়ার তখন হামাসের রাজনৈতিক শাখার নতুন নেতা হিসেবে দায়িত্ব নেন এবং এটি ছিল তার জন্য প্রথম পরীক্ষা।

যখন মাজেন ফুকাহার নিথর দেহ জানাজার জন্য রাখা হয়, সিনওয়ার এগিয়ে যান। ধীর, শান্ত পদক্ষেপে তিনি তার পুরোনো সঙ্গীর পাশে দাঁড়ান। মাথায় চুম্বন করেন এবং তার কানে কানে কিছু বলেন। হয়তো পুরোনো কোনো প্রতিশ্রুতি, হয়তো প্রতিশোধের শপথ—কিন্তু সেই কথাগুলো আমাদের জানার সুযোগ নেই। যা আমরা জানি, তা হলো, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গাজার নিরাপত্তা বাহিনী তিনজন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করে, যাদের অভিযুক্ত করা হয় ইসরায়েলের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি ও হত্যাকাণ্ডে সহায়তার অভিযোগে। সামরিক আদালত তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়, ফাঁসি ও গুলি করে তাদের শাস্তি কার্যকর করা হয়।

সিনওয়ার সরাসরি প্রতিশোধ নিতে উৎসাহী হননি। তবে পরবর্তী সময়ে তার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল পরিকল্পিত, ধৈর্যশীল এবং অনেকটাই অপ্রত্যাশিত। সিনওয়ার যে কঠোর প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে উঠেছেন, সেটি বোঝার জন্য আমাদেরকে তার জীবনযাত্রার তিনটি স্তম্ভ দেখতে হবে—শরণার্থীশিবির, ইসরায়েলের কারাগার এবং গাজার অবরুদ্ধ অঞ্চল। এই তিনটি অবস্থাই তাকে কঠোর, ধৈর্যশীল ও কৌশলী করে তুলেছে। ইসরায়েলি দখলদারিত্বের এই তিনটি স্তর একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল—ফিলিস্তিনিদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা। কিন্তু সিনওয়ার সেই স্তব্ধতাকে প্রতিরোধে রূপান্তরিত করেছেন।

তার প্রতিরোধ ছিল তিনটি স্তরের প্রতিফলন—শরণার্থীশিবিরের অসহায়ত্ব থেকে শুরু করে, কারাগারের অমানবিক নিপীড়ন এবং গাজার সর্বোচ্চ অবরোধের মুখোমুখি হয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই সিনওয়ার নিজেকে তৈরি করেছেন। তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি কৌশল ছিল ইসরায়েলের শৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে একটি সুপরিকল্পিত প্রতিরোধের অংশ।

এরপর ৭ অক্টোবর, ২০২৩-এর দিনটি এলো, যেদিন সিনওয়ার তার বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তার পূর্ণরূপ প্রকাশ করেন। হামাসের নেতৃত্বে আঘাত হানার নতুন নিয়ম প্রয়োগ করলেন। তিনি দখলদার ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধেই শুধু নয়, বরং গোটা বিশ্বের সামনে নিজেকে এমন এক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে তার জনগণের জন্য নতুন নিয়ম তৈরি করতে সক্ষম। তিনি 'খাওয়া' অর্থাৎ শক্তি প্রদর্শন করে বিশ্বকে বাধ্য করেছেন তাকে এবং তার সংগ্রামকে মেনে নিতে।

*　　*　　*

গাজা ছিল সুন্দর এবং আজও তা সুন্দর। তুমি কি দেখেছ আমাদের যুবকদের? তাদের প্রতিভা, সৃজনশীলতা এবং এতকিছুর পরেও তারা কতটা বিশ্বমুখী? আমাদের অনেক তরুণ পুরোনো কম্পিউটার ও ফ্যাক্স মেশিন ব্যবহার করে, থ্রিডি প্রিন্টার বানিয়েছে—এমনকি তা দিয়ে তারা চিকিৎসা সরঞ্জাম তৈরি করছে, যে-সরঞ্জামগুলো আমাদের দেশে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এটাই গাজা। আমরা কোনো দরিদ্র বা অসহায় শিশু নই। আমরা সিঙ্গাপুর বা দুবাইয়ের মতো হতে পারি। আসুন, আমরা সময়কে আমাদের পাশে আনি এবং আমাদের ক্ষতগুলো সারিয়ে তুলি।

আমি পঁচিশ বছর কারাবন্দি ছিলাম। আমার এই সঙ্গী তার ছেলেকে হারিয়েছে—বিমান হামলায় সে শহীদ হয়েছে। আমাদের দোভাষী তার দুই ভাইকে হারিয়েছে। আর তোমাকে চা পরিবেশন করা মানুষটির স্ত্রী মারা গিয়েছে একটি সাধারণ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে—অথচ তা সহজ অ্যান্টিবায়োটিকে সারানো যেত, কিন্তু গাজায় ওষুধটি পাওয়া যায়নি। তুমি কি ভাবো, এ জীবন সহজ? আমরা যুদ্ধ বন্ধের মধ্য দিয়ে শুরু করতে পারি। আসুন, আমাদের সন্তানদের এমন একটি জীবন দিই, যা আমরা পাইনি। একটি ভিন্ন জীবন তাদের একটি ভিন্ন ভবিষ্যৎ তৈরি করতে দেবে।

কথাগুলো বলেছিলেন ইয়াহইয়া সিনওয়ার, ২০১৮ সালের অক্টোবরে, এক ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্রানচেসকা বোরির (Francesca Borri) সাথে কথা বলতে গিয়ে। সেই সময় সিনওয়ার ছিলেন গাজার হামাসের রাজনৈতিক শাখার নেতা। তবে সম্ভবত সিনওয়ার জানতেন না যে, তার এই সাক্ষাৎকারটি পরে ইসরায়েলের সংবাদপত্র ইয়েদিয়ট আহরোনটে (Yedioth Ahronoth) প্রকাশিত হবে।

যদিও সিনওয়ারের দপ্তর তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেয় যে, তিনি সরাসরি ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলেননি; বরং ফ্রানচেসকা বোরির মাধ্যমে তার কথা সেখানে পৌঁছেছে, তবুও এই সাক্ষাৎকারে ইসরায়েলি মহলে যে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল, তা আর থামানো যায়নি। বোরির প্রতিবেদনে সিনওয়ারকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, যা আগে কখনো দেখা যায়নি—একজন নেতা হিসেবে যিনি যুদ্ধকে ঘৃণা করেন, শান্তি চান এবং তার জনগণের জন্য বাস্তবতা পরিবর্তন করতে আগ্রহী।

সিনওয়ার বারবার 'ইসরায়েল' শব্দটি এড়িয়ে গেছেন, তার বদলে তিনি ব্যবহার করেছেন 'নেতানিয়াহুর সরকার', 'অন্যপক্ষ' বা সাধারণ 'দখলদার বাহিনী' জাতীয় শব্দগুলো। তিনি কখনই ইহুদিদের বিরুদ্ধে কথা বলেননি, বা 'জায়োনিস্ট রাষ্ট্র' শব্দটিও ব্যবহার করেননি। কেন? পশ্চিমা দুনিয়ায় এই

শব্দচয়ন কিছু সমালোচনা ডেকে আনতে পারে। কিন্তু যা তিনি বলেছেন, তা ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমবারের মতো ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমে গাজার একজন হামাস নেতাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হলো, যেখানে তিনি যুদ্ধ চান না; বরং একটি ভালো ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য শান্তি চেয়েছেন। তিনি কারাগারে কাটানো সময়ের প্রভাব স্বীকার করে বলেন যে, তিনি তার শত্রুদেরও কারাগারে যেতে দেখতে চান না। তিনি বলেন, যারা আজ তার জাতিকে বোলিং বলের মতো গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, তারা বুঝতে পারছে না, ২৫ বছর পর তারা হয়তো হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াবে। তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন যে, তিনি ইসরায়েলের সাথে আরেকটি যুদ্ধ চান না। এই বক্তব্যের ওপর জেরুসালেম পোস্ট মন্তব্য করে বলেছিল, এটি নতুন কিছু নয়। আগের কয়েক মাসে হামাসের অন্যান্য নেতাও একই কথা বলেছিলেন এবং মিশরের গোয়েন্দা সংস্থা ও জাতিসংঘের মধ্যস্থতাকারীরাও নিশ্চিত করেছিলেন যে, হামাসের আলোচকরা বারবার এই বার্তাই দিচ্ছিলেন—তারা যুদ্ধ চান না, তারা চায় গাজার ওপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করা হোক।

ইসরায়েলের রাজনৈতিক মহলে সিনওয়ারের এই বার্তা নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। বিশ্লেষকরা বলেছিলেন, সিনওয়ার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন, যেন তিনি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রধান মেহমুদ আব্বাসের বদলে সিনওয়ারকে আলোচনার অংশ করেন। তবে ইসরায়েলি সমাজে এই বার্তাকে সবাই সমানভাবে গ্রহণ করেনি। সিনওয়ারের ব্যক্তিত্ব ইসরায়েলের কাছে বরাবরই জটিল এক ধাঁধা হয়ে ছিল।

এক মাস পর ২০১৮ সালের ১১ নভেম্বর ইসরায়েলি সেনাবাহিনী সিনওয়ারের নেতৃত্ব পরীক্ষা করতে আসে। ইসরায়েলের এলিট কমান্ডো ইউনিট সায়েরেত মাতকাল (Sayeret Matkal) খান ইউনিসে গোপন অভিযান চালায়—যেখানে তাদের সেনারা বেসামরিক পোশাক পরে, এমনকি নারীদের পোশাক পরে অপারেশন পরিচালনা করছিল। কিন্তু কাস্‌সাম ব্রিগেডের কমান্ডার নুরেদ্দিন বারকা তাদের ধরে ফেলেন। ইসরায়েলি কমান্ডোরা তাকে গুলি করে হত্যা করে, কিন্তু কাস্‌সাম যোদ্ধারা পালটা আক্রমণ চালিয়ে গাড়িটি ধাওয়া করে।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইসরায়েলের বিমানবাহিনী কামানের গোলা ছোড়া শুরু করে। এতে ছয়জন ফিলিস্তিনি শহীদ হন। হামাস পালটা রকেট হামলা চালায়, যা দুই দিনের সংঘাতে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত মিশরের গোয়েন্দাপ্রধান আব্বাস কামাল সিনওয়ার ও হামাসের সাথে যোগাযোগ

করেন এবং তাদের ধৈর্য ধরতে ও শান্তি বজায় রাখতে বলেন। সংঘাতের অবসান ঘটে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে, যার পরপরই ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী অভিগদর লিবারম্যান (Avigdor Lieberman) পদত্যাগ করেন, কারণ তিনি 'সন্ত্রাসীদের কাছে আত্মসমর্পণ' মানতে পারেননি। যদিও লিবারম্যান পদত্যাগ করেছিলেন, ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, হামাস আরেকটি বড় সংঘাত চায় না।

খান ইউনিসের এই সংঘর্ষের ঘটনা ইসরায়েলের জন্য একটি বার্তা ছিল যে—হামাস প্রতিরোধের নতুন নিয়ম তৈরি করেছে। সিনওয়ারের নেতৃত্বে গাজার মানুষ ইসরায়েলের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং গাজাবাসীরা তাদের প্রতিরোধের মাধ্যমে শক্তিশালী বার্তা দিয়েছে।

২০১৭ সালে ইয়াহইয়া সিনওয়ার গাজায় হামাসের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার এক মাস পরই হামাসের রাজনৈতিক দপ্তরের সদস্য সালাহ আল-বারদাউইল ফরাসি পত্রিকা লি ফিগারোর (Le Figaro) এক সাংবাদিককে বলেছিলেন, "হামাসের রাজনৈতিক নীতি সিনওয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করে, তিনি নীতি নিয়ন্ত্রণ করেন না।" আল-বারদাউইল একটি আকস্মিক তুলনাও করেন এবং বলেন, "লিবারম্যানকে মনে আছে? বিরোধী দলে থাকার সময় তিনি গাজাকে পুড়িয়ে ফেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিরক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর তিনি সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যান। ইয়াহইয়া সিনওয়ারের ক্ষেত্রেও তুমি একইরকম কিছু আশা করতে পারো।"

শহীদ নুরেদ্দিন বারকা এবং তার সঙ্গীদের স্মরণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে, সিনওয়ার দাতাদের ধন্যবাদ জানান এবং ব্যাখ্যা করেন কীভাবে এই সহায়তা গাজার জনগণের জন্য উপকার বয়ে এনেছে। তিনি প্রশ্ন করেন, 'শত্রু কী ভাবছিল যখন তারা আমাদের কাছে ডলার এবং তেল প্রবেশ করতে দিয়েছে? তারা কি ভেবেছিল আমরা আমাদের রক্ত বিক্রি করছি?' এরপর তিনি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করেন, যেখানে হজরত সুলায়মান (আ.) বলেছিলেন: "তোমরা আমাকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? ... ফিরে যাও তাদের কাছে। আমরা এমন সৈন্য নিয়ে আসব যাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের নেই। আমরা তাদের লাঞ্ছিত করে সেখান থেকে বের করে দেবো, তারা হবে অপমানিত।"

ইসরায়েলিরা প্রথমে সিনওয়ারের হুমকিকে গুরুত্ব দেয়নি; বরং ইসরায়েলের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ধারণা করেছিল যে, সিনওয়ার যুদ্ধ নয়, বরং শাসনব্যবস্থায় মনোযোগ দিতে চান। এমনকি তারা ফিলিস্তিনি

কর্তৃপক্ষের উদাহরণও দেখিয়েছিল। এই ধারণা থেকেই ইসরায়েলি বাহিনী গাজা সীমান্তে নজরদারি কমিয়ে দেয় এবং তাপীয় ও ইলেকট্রনিক সেন্সরের ওপর নির্ভর করে। অনেক সেনাসদস্যকেও গাজার সীমান্ত থেকে সরিয়ে পশ্চিম তীরের বসতিগুলোর নিরাপত্তায় নিয়োগ করা হয়।

শিন আরতজি সরুর (Shin Aradzi Srur) নামে একজন বিশ্লেষক ইয়েদিয়ট আহরোনট পত্রিকায় উল্লেখ করেন, ইসরায়েলি বিশ্লেষকরা ইরান ও সিরিয়াকে একটি অস্তিত্বের হুমকি হিসেবে দেখছিল, কিন্তু ফিলিস্তিনিদের তেমনভাবে দেখেনি। এমনকি ইসরায়েলি প্রশাসন মনে করেছিল সিনওয়ার শান্ত হয়ে গেছে। তিনি ফিলিস্তিনি শ্রমিকদের ইসরায়েলে কাজের অনুমতি আদায় করতে সক্ষম হন, যাদের মধ্যে প্রায় ১৮,০০০ মানুষ প্রতিদিন কাজ করছিল। এটি ইসরায়েলকে আরেকটি বার্তা দেয় যে, সিনওয়ার সম্ভবত গাজার শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে মনোযোগ দিচ্ছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি ইসরায়েলি অভ্যন্তরীণ তথ্যও সংগ্রহ করেন।

ইসরায়েলিরা বলে, ২০২৩ সালের আগস্টে সিনওয়ার একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা পাঠিয়েছিলেন নেতানিয়াহুকে, যা দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার দিকে ইঙ্গিত করেছিল, যাতে গাজা অর্থনৈতিকভাবে শ্বাস নিতে পারে। এই সময়ের মধ্যে হামাস বেশ কয়েকটি সামরিক সংঘাত থেকে দূরে থাকে এবং গাজার স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে উত্তেজনা বাড়ানোর সুযোগগুলো এড়িয়ে যায়, বিশেষ করে ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত ইসরায়েলি পতাকা মিছিলের সময়।

গাজায় সিনওয়ারের নেতৃত্বে হামাস একটি 'কৌশলগত ধৈর্য' অবলম্বন করেছিল; যদিও কাস্‌সাম ব্রিগেড এবং হামাসের অন্যান্য শাখা উত্তেজনা বাড়াতে চাপ দিচ্ছিল, সিনওয়ার সবাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পালটা আঘাত আসবে। হামাসের রাজনৈতিক দপ্তরের সদস্য এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাস্‌সাম নাইম বলেন, সিনওয়ার সবাইকে একটি বড় ঘটনার জন্য প্রস্তুত করছিলেন। যারা সংঘাত চেয়েছিল, তাদের তিনি বলতেন, "ধৈর্য ধরো, আমরা পুরো বিশ্বকে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবো।"

বিশ্ব যখন ২০২২ সালের ১৪ ডিসেম্বর কাতারে অনুষ্ঠিত ফুটবল বিশ্বকাপের মরক্কো-ফ্রান্স সেমিফাইনালে মগ্ন, তখন সিনওয়ার তার পরিকল্পনা সাজাচ্ছিলেন। সেই সময় তিনি হামাসের ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ভাষণে একটি সতর্কবাণী দিয়েছিলেন। তার ভাষণ ছিল 'প্রবল জলোচ্ছ্বাস আসছে!' তবে এই সতর্কবার্তার গুরুত্ব বুঝতে বিশ্বকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রায় ১০ মাস—অক্টোবর ২০২৩-এর ৭ তারিখের হামলা পর্যন্ত।

সিনওয়ার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছিলেন, হামাসের নেতাদের ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার কারণে তারা আজ 'তাদের শত্রুদের চোখের সামনে থেকে অপহরণ না হয়ে' নিজেরা অস্ত্র তৈরি করছে এবং সীমাহীন রকেট ছুড়ছে। সেই সময়ে ইসরায়েলিদের জন্য তার শেষ বার্তা ছিল একটি গুরুতর সতর্কতা। তিনি বলছিলেন, তিনি গাজার জনগণের সম্মানজনক জীবন এবং উন্নতি নিশ্চিত করতে চান। ইসরায়েলি প্রশাসনের কাছে এটি ছিল এই বার্তা যে, সিনওয়ার ও তার দল আগের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী। সিনওয়ার এক নিপুণ খেলোয়াড়ের মতো ইসরায়েলি প্রশাসনকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে, গাজা একটি নিয়ন্ত্রিত সুরক্ষিত অঞ্চল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শত্রুর মনস্তত্ত্ব নিয়ে খেলছিলেন। ইসরায়েলি কর্মকর্তারা তার চাতুর্যের পুরোটা তখনো বুঝতে পারেননি—এটি ছিল আরেক গল্প।

* * *

তিনি যেদিন কারাগারে প্রবেশ করেছিলেন, তখন ছিলেন একজন সাধারণ যোদ্ধা। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন একজন নেতা হয়ে। এমন একজন নেতা, যিনি দখলদার ইসরায়েলকে যেমন চিনেছিলেন, তেমনি নিজেকেও—নিজের শক্তি ও দুর্বলতা উভয়ই।

ইসরায়েলের কারাগারে ২০০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ওরিত আদাতো (Orit Adato) যখন দায়িত্ব নিলেন কারাগার ব্যবস্থাপনার, তখন প্রায় ৬০০ ফিলিস্তিনি বন্দি ছিল। তাদের অন্যতম ছিলেন ইয়াহইয়া সিনওয়ার। সম্ভবত তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বিপজ্জনক।

কয়েক মাস পর সেপ্টেম্বরে, আল-আকসা ইন্তিফাদা শুরু হবে। এর পরবর্তী মাস ও বছরগুলোতে ইসরায়েল হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে আটক করে, যাদের মধ্যে ছিলেন ইন্তিফাদার নেতৃত্বদানকারী ও প্রতিরোধ সংগঠনের নেতা, যেমন মারওয়ান বারঘুতি—ফাতাহর পশ্চিম তীরের নেতা এবং আব্বাস আল-সাইয়েদ—কাস্‌সাম ব্রিগেডের নেতা, যাকে ইসরায়েল সবচেয়ে বিপজ্জনক বন্দি হিসেবে বিবেচনা করত। এছাড়াও ছিলেন আবদুল্লাহ বারঘুতি—যার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের কারাগারে দীর্ঘতম শাস্তি দেওয়া হয় এবং আহমেদ সাদাত—পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইনের সাধারণ সম্পাদক।

প্রথম অধ্যায়

শীতের সেই দিনগুলো

১৯৬৭ সালের শীত ছিল অপ্রতিরোধ্য। শীতের প্রকোপ যেন বিদায়ই নিতে চাইছে না। তাপিত সূর্যের আলো নিয়ে বসন্ত আসার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু শীত তার মেঘ দিয়ে আকাশ ঢেকে ফেলছে। হঠাৎ হঠাৎ প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। গাজার 'শাতি' শরণার্থীশিবিরের অতিসাধারণ বাড়িঘর ডুবিয়ে দেয়। সরু গলিতে বন্যার পানি বয়ে বয়ে ছোট ছোট কক্ষের ঘরদোরে ঢুকে পড়ে। আমাদের মতো পরিবার, যারা সংলগ্ন রাস্তার চেয়ে নিচু মেঝের ঘরে বাস করে, তারা স্রেফ ভেসে যায় সয়লাবে।

প্রতি বছরই, শীতের বাঁধভাঙা বন্যার পানি আমাদের ছোট্ট আঙিনায় জোয়ার আনে। পানি ঢোকে ঘরের ভেতর—যে ঘরে ফালুজা শহর থেকে পালিয়ে এসে আমরা ১৯৪৮ সাল থেকে বাস করছি। প্রতিবার আমি, আমার তিন ভাই এবং এক বোন—যারা সবাই আমার চেয়ে বড়—আতঙ্কে বিহ্বল হই। বাবা কিংবা মা মেঝে থেকে আমাদের তুলে নেন। মা পানিতে ভিজে যাওয়ার আগমুহূর্তে বিছানাপাতি সরিয়ে রাখেন। আমি সবার ছোট ছিলাম তো, তাই মায়ের গলায় ঝুলে থাকতাম। আর আমার ছোট বোনকে মা সবসময় হাতে ধরে রাখতেন।

রাতে কখনো ঘুম ভেঙে দেখি, মা আমাকে সরিয়ে দিয়ে বিছানার পাশে একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল বা বড় মাটির পাত্র পেতেছেন। ছাদের ফাটল থেকে পানি চুইয়ে পড়ছে তাতে। পাত্রটি আরও নানা জায়গায় রাখতে হয়। ঘুমানোর চেষ্টা করি, কখনো সফল হই, কখনো পানির ফোঁটার শব্দে আবার জেগে উঠি। পেতে রাখা পাত্র ভরে গেলে মা নতুন আরেকটা এনে আগেরটা বদলে নেন, আর পানি বাইরে ঢেলে দেন।

তখন আমার বয়স পাঁচ বছর।

তেমনই এক শীতের সকাল। বসন্তের সূর্য এসে শিবির থেকে রাতের শীতের কামড়ের দাগ মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমার ভাই মোহাম্মদের বয়স তখন সাত। আমার হাত ধরে সেদিন শিবিরের পথ ধরে হাঁটছিল। শেষ মাথায় মিশরীয় সেনা ক্যাম্প। মিশরীয় সেনারা আমাদের খুব ভালোবাসত। একজন তো আমাদের নাম ধরে চিনতেন। দেখলেই ডাকতেন, মোহাম্মদ, আহমেদ... এদিকে আসো। আমরা তার কাছে যাই, মাথা নিচু করে দাঁড়াই, অপেক্ষা করি যে, তিনি আমাদের কী দেন। প্রত্যেকের জন্য তিনি পকেট থেকে বাদামের ক্যান্ডি বের করেন। আমরা আনন্দের সঙ্গে খাই। সৈনিকরা আমাদের কাঁধে হাত রেখে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। আমরা ধীরে ধীরে শরণার্থীশিবিরের পথ ধরে ফিরে আসি।

অনেক দিন থেকে-মেকে শেষে শীত একদিন চলে যায়। আবহাওয়া উষ্ণ ও সুন্দর হতে থাকে। বৃষ্টি আর আগের মতো আঘাত হানে না। খুশি হই যে, শীত আর শীঘ্র ফিরে আসছে না। কিন্তু চারপাশে এক ধরনের উদ্বেগ লক্ষ করি। সবার অবস্থা যেন কনকনে শীতের রাতের বানডাকা বৃষ্টির চেয়েও খারাপ। বুঝতে পারছিলাম না কিছুই, শুধু অনুভব করছিলাম—কিছু একটা ঠিক নাই। মা তার যত পাত্র ছিল, পানিভরতি করে সব ঘরের সামনে রাখেন। বাবা পাশের বাড়ি থেকে একটা কোদাল ধার করে এনে উঠানে বড় একটা পরিখা খনন করতে থাকেন। বড় ভাই মেহমুদ তাকে সাহায্য করেন। ভাইয়ার বয়স তখন বারো।

পরিখা বানানো হয়ে গেলে বাবা অনেক অনেক কাঠের টুকরো তার ওপরে বিছান। তারপর জিঙ্কো শিট দিয়ে ঢেকে দেন। শিটগুলো আগে উঠানের এক পাশে ছাউনিতে লাগানো ছিল। বুঝতে পারলাম, বাবা দুশ্চিন্তায় আছেন। দেখলাম, তিনি রান্নাঘরের দরজা খুলে সেটাকে পরিখার ওপরে রাখলেন। মা আর মেহমুদ ভাই প্রথমে নামেন পরিখায়। মুখটা তখনো পুরোপুরি বন্ধ হয় নাই। আমি সাহস করে একবার সেদিকে এগিয়ে যাই। নিচে উঁকিও দিই। একটা অন্ধকার প্রকোষ্ঠের মতো তৈরি হয়েছে দেখা যায়। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। হ্যাঁ, স্পষ্ট যে, সামনে একটা কঠিন এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আসছে, যা শীতের সেই ঝোড়ো রাতগুলোর চেয়েও ভয়ংকর।

এখন আর কেউ আমাকে হাত ধরে মিশরীয় সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যায় না, বাদামের ক্যান্ডিও পাই না। ওদিকে যাওয়ার কথা বললেই ভাইজান 'না' করেন। আমার ও তার জন্য এটা ছিল একটা বড় পরিবর্তন। আমি সেটা বুঝতাম না। কেন যে না করেন, ঘটনা যে কী, বন্ধু হাসানও তা জানে না।

আমি জানি না, কেননা আমাকে কেউ বলেনি। তবে আমার চাচাতো ভাই ইবরাহিম, যে আমার সমবয়সি এবং পাশের ঘরেই থাকে, সে সব জানে।

একদিন মোহাম্মদ আমাকে না নিয়ে কোথাও চলে গেল। আমি ইবরাহিমের সঙ্গে থাকব বলে চাচার বাড়িতে যাই। দরজা ঠেলে ঢুকে দেখি চাচা বসে আছেন। তার মুখের বিবরণ এখন আর মনে করতে পারি না। তার হাতে ছিল একটা রাইফেল, তিনি সেটা ঠিকঠাক করছিলেন। আমার দৃষ্টি সোজা সেই রাইফেলের ওপর আটকে থাকল। চাচা আমাকে ডাকলেন এবং তার পাশে বসালেন। তারপর রাইফেলটা আমার হাতে দিয়ে কী কী বললেন, যার অর্থ আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি আমাকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। আমি ইবরাহিমকে নিয়ে শিবিরের মাথায় মিশরীয় সেনা ক্যাম্পের দিকে হাঁটা দিলাম।

ওখানে পৌঁছে দেখি সবকিছু বদলে গেছে। সেই সৈনিক, যিনি সবসময় আমাদের অপেক্ষায় থাকেন, এবার আর স্বাগত জানালেন না। আসলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক সময়ের মতো ছিল না। মিশরীয় যে সেনারা আগে আমাদের সানন্দে অভ্যর্থনা জানাতেন, এবার তারা চিৎকার করে বললেন—যাও, দূরে চলে যাও, মায়ের কাছে ফিরে যাও। বাদামের প্রিয় ক্যান্ডি পাই নাই বলে হতাশ লাগছিল। বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম। বুঝতেই পারছিলাম না, কী পরিবর্তন ঘটেছে।

পরের দিন, মা কয়েকটা বিছানা-বালিশ এনে পরিখায় বিছালেন। দুই বা তিন জার পানি, আর কিছু খাবারও আনলেন। আমাদের সবাইকে পরিখায় বসালেন। চাচি, চাচাতো ভাই হাসান আর ইবরাহিমও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো। সেই ছোট, সংকীর্ণ জায়গায় বিরক্ত লাগছিল আমার—কোনো কারণ ছাড়া কেন এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘর, উঠান, শিবিরের রাস্তা ছেড়ে এখানে থাকতে কেন বাধ্য করা হচ্ছে। যখনই বের হওয়ার চেষ্টা করি, মা আমাকে টেনে ভেতরে বসিয়ে রাখেন। কখনো এক টুকরা রুটি বা কয়েকটা জলপাই দেন।

সূর্য ডুবে যেতে থাকে, দিনের আলো ফিকে হয়ে আসে, পরিখার আশ্রমে ক্রমশ বাড়ে অন্ধকার। আমাদের ছোটদের মনে ভয় বিঁধতে থাকে। আমরা চিৎকার করে বাইরে যেতে চাই, মা আর চাচি চেষ্টা করেন থামাতে। আমরা থামি না, বাইরে যাওয়ার জন্য আবার চেষ্টা করি। এবার তারা আরও জোরে চিৎকার করেন, বাচ্চারা, এটা যুদ্ধ, তোমরা কি জানো যুদ্ধ কী?

যুদ্ধ কী তখনো আমি জানি না। শুধু বুঝতে পারি—একটা ভয়ংকর, অস্বাভাবিক এবং অন্ধকারময় কিছু হবে।

আমরা তারপরও বেরুতে চাই, তারা আমাদের থামান। দিনে দিনে আমাদের কান্নার আওয়াজ জোরালো হয়। তারা আমাদের যতই শান্ত করতে চান, লাভ হয় না। অবশেষে মেহমুদ ভাই বললেন, মা, আমি কি আলো নিয়ে আসব, বাতি জ্বালব? মা বললেন, আচ্ছা, জ্বালো। মেহমুদ পরিখা থেকে বের হতে গেলে মা তাকে ধরে ফেলেন। বলেন, বের হয়ো না, মেহমুদ।

মা তাকে বসিয়ে রেখে নিজে বের হন। কিছুক্ষণ পরে কেরোসিনের কুপি নিয়ে ফিরে আসেন। জ্বালার সাথে সাথেই পরিখার ভেতর আলো ছড়িয়ে পড়ে। আমরা শান্ত হয়ে ঘুমাই। মা আর চাচিও চোখ বোজেন, কিন্তু ঘুমাতে পারেন না, থেকে থেকে জেগে ওঠেন।

পরের দিনও বিশেষ কিছু ঘটেনি। আমরা দিনভর পরিখার ভেতরে কাটাই। প্রতিবেশী শিক্ষিকা আয়েশা সারাক্ষণ রেডিও ধরে থাকেন। পরিখার খোলা অংশে গিয়ে রেডিও তরঙ্গ ভালোভাবে ধরার চেষ্টা করেন, যেন সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর মিস না হয়। প্রতিটি নতুন সংবাদ শোনার পর তিনি মা ও চাচিকে জানান, ভেতরের পরিবেশ আরও বিষণ্ন হয়, হতাশায় ছেয়ে যায়। বিষণ্নতা ও দুঃখের ছায়া আমাদের সবার ওপরই পড়ছিল। মা-চাচি দুজনেই আমাদের চুপ থাকতে বলেন, কিন্তু তাদের কণ্ঠে যেন আরও বেশি হতাশা। কায়রো থেকে আহমেদ সাইদের উগ্র বক্তৃতা, ইহুদিদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার হুমকি, ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে সব। আমাদের ঘরে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বালির দুর্গের মতো ধসে পড়ে। আরও ছোট থাকতে খেলতে গিয়ে যেমন বালির দুর্গ বানাতাম, তেমন। সবার এখন শুধু একটাই চাওয়া—আমাদের চাচা, যিনি প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মির সৈনিক, তিনি নিরাপদে ফিরে আসুন। আমার বাবা, যিনি পপুলার রেজিস্ট্যান্সের যোদ্ধা, তিনিও সালামতে ফিরুন।

প্রতিটি নতুন সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আয়েশা আরও মনমরা হন। পরিস্থিতি আমাদের সবাইকে আরও বেশি আতঙ্কিত করতে থাকে। অন্ধকারের মতো বিস্ফোরণের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ে, কাছাকাছি ঘনিয়ে আসে। মা প্রায়ই পরিখা থেকে বের হয়ে ঘরে যান। খানিক পর খাবার, কাপড়, অথবা অন্য কিছু নিয়ে ফিরে আসেন। চাচির সঙ্গে বলেন যে, দাদাকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তা হয়। দাদা আমাদের সঙ্গে পরিখায় থাকতে চান না, তিনি ঘরে তার ছোট্ট কক্ষে থাকেন।

প্রথম প্রথম তার বিশ্বাস ছিল, সামনে যে সময় আসছে, তাতে আমরা ফালুজায় আমাদের বাড়ি ও খামারে ঠিক ঠিক ফিরে যেতে পারব, কোনো বিপদ হবে না। বিপদ হবে ইহুদিদের—আরব সেনাবাহিনী তাদের টুকরো

টুকরো করবে। পরে তিনি বুঝতে পারেন, যুদ্ধের হিসাব ঘুরে গেছে, নতুন সমীকরণ আমাদের পক্ষে না। তখন আর পরিখায় নামতে রাজিই হলেন না। তার মতে, জীবনের আর কী অর্থ আছে! তিনি জিজ্ঞেস করতেন, আমরা এভাবে কতদিন লুকিয়ে থাকব? চিরকালই কি ভাগ্য থেকে পালাতে হবে আমাদের?

তার কাছে তখন মৃত্যু আর জীবন এক হয়ে গেছে।

আবারও রাতের অন্ধকার নেমে আসে, আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। বেশ কয়েকবার ঘুম ভেঙে যায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে। পরদিন সকালে বিস্ফোরণের শব্দ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সেদিন বিশেষ আর কোনো ঘটনা ঘটেনি। শুধু একটা ব্যাপার—অনেক মানুষ একযোগে চিৎকার করছিল, গোয়েন্দা! গোয়েন্দা!

স্পষ্ট যে, তারা সেই গোয়েন্দাকে তাড়া করছিল। গোয়েন্দার সাথে কী জানি একটা ছিল, দেখতে গাড়ির মতো, অথবা চাকার মতো হবে। মানুষজন তাকে তাড়া করছে, আর আমি তাকিয়ে আছি মা, চাচি আর প্রতিবেশী আয়েশার মুখের দিকে। তাদের আলাপ শুনে বুঝতে পারছি, ইহুদিদের সাথে এই গোয়েন্দার কোনো একটা সম্পর্ক আছে।

বিস্ফোরণ আরও ঘনঘন ও বিকট হয়ে ওঠে। কাছাকাছি কোথাও ফাটছে। মনে হয়, পশ্চিমের বাড়িঘরে আঘাত হানা শুরু করেছে। প্রতিটি নতুন বিস্ফোরণে আমরা আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি। চিৎকার আর কান্নার আওয়াজ বাড়ছে। যদিও সবাই চেষ্টা করছে শান্ত থাকার। আয়েশা একইভাবে পরিখার খোলা অংশের কাছে যাচ্ছেন, খবর শুনছেন এবং নতুন খবর মা ও চাচিকে জানাচ্ছেন। প্রথম দুই দিনের মতো মা আজকাল আর বারবার ঘরে যান না, যেতে পারছিলেন না। একদিন আয়েশা খবর শুনতে শুনতে কান্না শুরু করেন। তার পা গোটা শরীরসহ কাঁপতে থাকে। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, বিড়বিড় করে বলেন, ইহুদিরা দেশ দখল করে নিয়েছে।

একমুহূর্তের জন্য চারপাশ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সেই নীরবতা ভেঙে আমার ছোট বোন মরিয়ম ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে। তাতে আমরা সবাই কান্না জুড়ে দিই। আমাদের মায়েরাও কাঁদতে থাকেন।

তারপর গোলাগুলি-বিস্ফোরণ বন্ধ হয়ে গেল। ভারী শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। হুট হুট হালকা গুলির আওয়াজ মাত্র। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে সেটুকু আওয়াজও থেমে গেল। চারপাশে নেমে এলো এক অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য। রাত গভীর হলে প্রতিবেশীদের আওয়াজ বাড়তে থাকে। তারা

লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। যিনি পুরোটা সময় ঘরে ছিলেন, তিনিও ঘর ছেড়ে বাইরে এলেন। আয়েশা গেলেন পরিস্থিতি দেখতে। ফিরে এসে বললেন, যুদ্ধ শেষ...আসুন, বের হয়ে আসুন।

মা আর চাচি প্রথমে বের হলেন, তারপর আমাদের ডাকলেন।

অনেক পর আমরা খোলা বাতাসে শ্বাস নিলাম। সে বাতাসে বারুদের গন্ধ আর ধ্বংস হওয়া ঘরবাড়ির ধুলা মিশে আছে। মা আমাকে ঘরের দিকে টেনে নেওয়ার আগে চারপাশের ধ্বংসযজ্ঞ একনজর দেখে নিলেন। ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়ির ভগ্নাবশেষ চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। শুধু আমাদের বাড়ি অক্ষত, কোনো ক্ষতি হয় নাই। ঘরে ঢোকার পর, দাদা আমাদের সবাইকে কাছে টেনে নিলেন। এক এক করে আমাদের চুমু খেলেন। আল্লাহকে শুকরিয়া জানালেন আমাদের নিরাপদে রাখার জন্য। আমাদের বাবা ও চাচার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করলেন।

রাতে চাচি ও তার দুই ছেলে আমাদের সঙ্গেই থাকলেন। আমার বাবা ও চাচা সেই রাতে ফিরে আসেননি। মনে হচ্ছিল, তাদের ফিরে আসতে আরও অনেক সময় লাগবে। সকালে, শিবিরের গলিগুলোতে ধীরে ধীরে মানুষের চলাচল শুরু হয়। সবাই তাদের সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের খুঁজে বের করছিলেন, তাদের নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করছিলেন এবং যেসব ঘরবাড়ি গোলাবারুদে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলোর পরিণতি কী ঘটেছে তা বোঝার চেষ্টা করছিলেন।

পাড়ার মধ্যে কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও অধিকাংশ মানুষ নিজেদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল সমুদ্রের তীরে, খামারে কিংবা কাছাকাছি খোলা জায়গায়। কেউ কেউ আগেভাগেই খুঁড়ে রাখা পরিখাগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে।

* * *

জানা গেলো, দখলদার বাহিনী একটা এলাকায় প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে পিছিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর একটা ট্যাংক এবং সামরিক জিপের দল দেখা দেয়, যার ওপর মিশরীয় পতাকা উড়ছিল। প্রতিরোধ যোদ্ধারা আনন্দে ফেটে পড়ে। তারা ভাবল, সাহায্য এসে গেছে। তারা নিজ অবস্থান ও পরিখা থেকে বের হয়ে এসে আকাশে গুলি ছুড়তে ছুড়তে তাদের স্বাগত জানাতে জমায়েত হয়। কিন্তু তাদের এই আনন্দ বেশি সময় স্থায়ী হলো না। বাহিনী তাদের কাছে পৌঁছার পর হঠাৎ প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ শুরু হলো। অনেক প্রতিরোধ যোদ্ধা মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে দেখা যায়, সেই ট্যাংক ও সাঁজোয়াযানের ওপর থেকে মিশরীয় পতাকা সরিয়ে ইসরায়েলি পতাকা তোলা

হয়েছে।

যুদ্ধের আগে যে স্কুলটি মিশরীয় সেনাদের ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হতো, সেই স্কুলের দিকে মানুষজন ভিড় জমায়। প্রত্যেকে যা কিছু অবশিষ্ট আছে, সব লুটে নিতে চেষ্টা করে। কেউ চেয়ার, কেউ টেবিল, কেউবা বস্তাভরতি শস্য নিয়ে যাচ্ছে। কেউ আবার রান্নাঘরের সরঞ্জাম বা সামরিক ক্যাম্পে ফেলে রাখা অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করছে। এই বিশৃঙ্খলা কয়েক দিন ধরে চলতে থাকে।

একদিন দুপুরের আগে দূর থেকে মাইকে ভাঙা আরবিতে কার্ফিউয়ের ঘোষণা শোনা যায়। বলা হতে থাকে, সবাইকে বাড়ির ভেতরে থাকতে হবে। বাইরে বের হলে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে। সামরিক জিপগুলো মাইকের মাধ্যমে বার্তা প্রচার করতে করতে ঘোরে। এরপর ঘোষণা আসে, ১৮ বছরের বেশি বয়সের সব পুরুষ কাছাকাছি স্কুলে সমবেত হবে। আদেশ না মানলে মৃত্যু।

আমার বাবা ও চাচা এখনো ফিরে আসেননি। বড় ভাই মেহমুদের বয়সও ১৮ বছরের কম। দাদা স্কুলের দিকে যাচ্ছিলেন, এক সৈনিক তাকে দেখে, তার বয়স ও দুর্বলতা দেখে তাকে ফিরে যেতে বলে। দাদা দিশাহারা হয়ে ফিরে আসেন। কিছুক্ষণ পর দখলদার সেনারা দলবদ্ধভাবে বন্দুক উঁচিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারা ঘরে ঘরে গিয়ে যেসব পুরুষ স্কুলে যায়নি তাদের খুঁজে বের করে। যাদের খুঁজে পায়, তাদের কোনো দ্বিধা ছাড়াই গুলি করে হত্যা করে।

পাড়ার পুরুষরা কাছাকাছি স্কুলে একত্র হয়। সেখানে সৈনিকরা তাদের মাটিতে সারিবদ্ধভাবে বসায়। চারপাশ থেকে বন্দুক তাক করে রাখা। কাজ শেষ হওয়ার পর একটি সামরিক জিপ এসে পৌঁছায়। জিপ থেকে একজন নামেন, যিনি বেসামরিক পোশাক পরা, কিন্তু দখলদার বাহিনীর সদস্য। তিনি পুরুষদের একে একে জিপের সামনে দিয়ে হাঁটতে বলেন। কিছুক্ষণ পরপর, এক সৈনিকের ইশারায় সতর্কতা সংকেত (হর্ন) বাজানো হয়। যদি কোনো পুরুষ জিপের সামনে দিয়ে যায়, আর সংকেত বেজে ওঠে, অমনি সৈনিকরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে জোরপূর্বক টেনে-হিঁচড়ে পিছনের একটি কঠোর প্রহরাবেষ্টিত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। স্কুলের প্রধান মাঠের তুলনায় দ্বিগুণ কঠিন নিরাপত্তায় আবৃত ঘেরে তাকে আটকে রাখা হয়।

এটা স্পষ্ট ছিল যে, যার জন্য সংকেত বাজানো হচ্ছে, তার বিপদ অনিবার্য। এভাবে একের পর এক পুরুষকে যাচাই করা হচ্ছে, মাঝে মাঝে সংকেত বাজানো হচ্ছে, কেউ কেউ ধরা পড়ছেন। সংকেত যাদের জন্য নয়, তারা মাঠের অন্য পাশে গিয়ে বসছেন।

কাজ শেষ হওয়ার পর, সেই বেসামরিক পোশাক পরা কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে বসা পুরুষদের সঙ্গে আরবিতে কথা বলার উদ্যোগ নেন। ভাষাটি ভারী হলেও তাদের বুঝতে কষ্ট হয় না। নিজেকে তিনি 'আবু আল-দীব' পরিচয় দেন। তিনি ইসরায়েলি গোয়েন্দা বাহিনীর কর্মকর্তা এবং এই এলাকার দায়িত্বে আছেন। দীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি আরবদের পরাজয়ের পর নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন। জানান যে, তিনি চান এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা থাকুক, কোনো সমস্যা না। যদি কেউ নিরাপত্তা নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করে, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড বা চৌদ্দ শিকের মুখোমুখি হতে হবে। আরও বলেন, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সেবা চাইলে তার অফিস সবসময় খোলা। বক্তৃতা শেষে উপস্থিত সবাইকে একে একে শান্তভাবে স্কুল ত্যাগ করতে বলেন।

লোকজন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে স্কুল থেকে নিজেদের ঘরের দিকে রওনা দেন। প্রত্যেকে অনুভব করেন যে, তারা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরছে। পাড়ায় বসবাসরত মোটামুটি শতাধিক পুরুষকে আলাদা করা হয়েছিল।

কর্মকর্তা এবার জিপ নিয়ে সেই জায়গায় গেলেন, যেখানে সন্দেহজনক পুরুষদের জড়ো করা হয়েছে। তিনি তাদের আবারও জিপের সামনে দিয়ে হাঁটতে বললেন। যার সামনেই সংকেত বেজে উঠছে, আগের মতোই তাকে টেনে নিয়ে দেওয়ালের পাশে উলটো করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদের মাঠের একপাশে বসতে বলা হয়।

এভাবে সেখানে ১৫ জন পুরুষকে বেছে নেওয়া হলো এবং দেওয়ালের পাশে দাঁড় করানো হলো। তাদের সামনে বন্দুক উঁচিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা সৈন্যদের সেই কর্মকর্তা নির্দেশ দিলেন। সৈন্যরা তাদের দিকে তাক করে গুলি চালালো। তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বেঁচে গেলেন যারা, মানে যাদের আলাদা ঘরে রাখা হয়েছিল, এতক্ষণে তারা ঘামে ভিজে গিয়েছিল। তাদের হাত পেছনে বেঁধে চোখ ঢেকে দেওয়া হলো। এরপর তাদের একটি বাসে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো মিশর সীমান্তের দিকে। সৈন্যরা তাদের বলল, সীমান্ত পার হয়ে যেতে। সাবধান করল যে, কেউ পেছনে তাকালে বা এগিয়ে না গেলে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুদ্ধের পরের যুদ্ধ

দিনের পর দিন কেটে যায়—বাবা আর চাচার খোঁজ নেই। ফিরে আসবে কি আসবে না সে খবরও পাচ্ছি না। আমার দাদা, মা ও চাচি এমন কেউ নেই বা এমন কোনো সম্ভাব্য উৎস নেই যেখানে যার কাছে গিয়ে ধরনা দেননি। কিন্তু সব চেষ্টা বিফলে। এমন উৎকণ্ঠা শুধু আমাদের একার না; পাড়ার আরও অনেকের ছিল। প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মি এবং পপুলার রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্টের অনেক যোদ্ধা নিখোঁজ। পশ্চিম তীর বা গাজার অন্যান্য এলাকার মতো আমাদের পাড়ায়ও হতাশা, ক্ষোভ আর বিশৃঙ্খলা নেমে এসেছে। মানুষজন দিশাহারা হয়ে পড়েছে। কী করতে হবে, কীভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দেবে—কেউই নিশ্চিত জানে না।

প্রতিদিন সকালে দাদাজান লাঠি ঠুক ঠুক করে বের হন দুই সন্তানের খোঁজে। চেনা হোক কিংবা অচেনা— সবাইকে ধরে ধরে জিজ্ঞেস করেন। ক্লান্তিতে শরীর নুয়ে না এলে থামেন না। মা ও চাচি—যারা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও এ-বাড়ি ছেড়ে নিজ বাড়িতে যাননি—দুজনে দিনমান দরজার পাশে বসে থাকেন দাদার ফিরে আসার অপেক্ষায়, যদি নতুন কোনো খবর নিয়ে আসেন! স্বামীর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয়ে, দুশ্চিন্তায় তারা একেবারে কাতর হয়ে পড়েন। আমার ভাইবোনেরা, এমনকি চাচাতো ভাইবোনেরাও কী হচ্ছে সব আন্দাজ করতে পারছে, কিন্তু আমি তখন এত ছোট যে, গোটা বিষয় ঠিকঠাক বোঝার ক্ষমতা ছিল না।

দুশ্চিন্তায় মা-চাচি কেউ আমাদের ঠিকমতো দেখভাল করার তাকত পান না। বড় বোন ফাতিমা কিছুটা দায়িত্ব নেয়। আমাদের খাওয়াদাওয়া কিংবা একটু-আধটু ঝাড়পোছ মাঝেমধ্যে ওকেই করতে হয়।